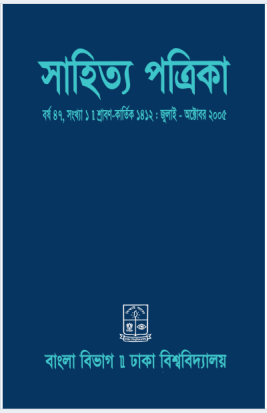


Vol. 47 | No. 1 | 2005

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

# হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : কাহারকুলের মহাকাব্য

| | |
|---|---|
| Volume | 47 |
| Issue | 1 |
| Year | 2005 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | Gias Shamim |
| Published online | October 1, 2005 |
| DOI | 10.62328/sp.v47i1.4 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v47i1.4 |
| Pages | ৬৫-৭৮ |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

Check for updates

# হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : কাহারকুলের মহাকাব্য

গিয়াস শামীম*

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) স্থিতপ্রজ্ঞ জীবন ও শিল্পভাবনার অসাধারণ শিল্পকীর্তি *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* (১৯৪৭)। ভারতবিভাগের অব্যবহিত প্রাক্ পর্যায়ে প্রকাশিত এ-উপন্যাসে জীবন ও শিল্পের ঘটেছে বিস্ময়কর মিথস্ক্রিয়া। অধিকাংশ উপন্যাসের মত, এ-উপন্যাসেও, তিনি পরিপ্রেক্ষিতরূপে বিবেচনা করেছেন রাঢ় অঞ্চলের প্রকৃতি, নিসর্গ ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত জনজীবন। আজন্ম রাঢ়ের ভূ-প্রাকৃতিক যে ঐতিহ্য তিনি তাঁর প্রকৃতি ও প্রতিভায় লালন করেছেন, তা-ই পরিস্ফুটিত হয়েছে তাঁর শিল্পকর্মে, বিশেষত 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য়।

রাঢ় অঞ্চলের রুক্ষ ও রূঢ় ভূ-পরিবেশে, বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে তারাশঙ্করের জন্ম। জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে লাভপুরের গ্রামসীমায় আবদ্ধ থেকে তিনি লক্ষ করেছেন সামন্তযুগের অস্তাচল-যাত্রা; দেখেছেন ব্রিটিশ বণিকরাজের প্রতাপ ও পতন। কালের পরিবর্তনে, যন্ত্রদানবের পেষণে ও মন্থনে সনাতন গ্রামসমাজের সুধাপ্রাপ্তি ও বিষোদগারের ধ্বংসাত্মক রূপও তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন নিবিড়ভাবে। সময়স্রোতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে কীভাবে বহমান নরগোষ্ঠীর জীবনধারায় রূপ-রূপান্তর সংঘটিত হয়, জীবনের ভূগোল কীভাবে বদলে যায়, তা আশৈশব তিনি অর্জন করেছেন রাঢ়ের বিচিত্র প্রাণপ্রবাহের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়সূত্রে। তারাশঙ্করের 'সাহিত্যের মূলসত্তা ও আত্মার সন্ধান পাওয়া যায় রাঢ়ের লোকসমাজ ও লোকসংস্কৃতিতে। তাঁর সাহিত্যের প্রাণশক্তির প্রস্রবণ এই লোকসমাজের গিরিগহ্বর থেকে উৎক্রান্ত।'[১] *'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'*য় এই চিত্র গভীর ব্যাপকতায় সুপ্রত্যক্ষ।

তারাশঙ্করের শিল্পসাহিত্য প্রধানত রাঢ় অঞ্চলের জীবন ও সমাজের রূপ- রূপায়ণ। কৌম সমাজ-সংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় সমগ্রতা তাঁর উপন্যাসে বহুমাত্রিকতায় সংগ্রথিত। বীরভূম অঞ্চলে বিরাজিত সার্বস্তরিক জাতিসত্তার অত্যাশ্চর্য সমাবেশে তাঁর উপন্যাস সমৃদ্ধ। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সংস্কৃতির সামবায়িক গ্রন্থনায় যে জগৎ তিনি নির্মাণ করেছেন তা অনন্যলব্ধ। কুলীন ব্রাহ্মণ, বাউল-বৈষ্ণব, সাধু-সন্ন্যাসী, তান্ত্রিক, ভৈরব-ভৈরবী, ধর্মান্তরিত মুসলমান, ক্ষুদ্র-বৃহৎ জমিদার, বর্ণহিন্দু বহির্ভূত হাড়ি, বাগ্দি , বাউরি,

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কেউট, ডোম, কাহার[২] প্রভৃতি শ্রেণী ও পেশার মানুষ তাঁর উপন্যাসে জীবন্ত অবয়বে উদ্ভাসিত। একদিকে আত্মসমাহিত প্রাচীন-অনুবর্তী সমাজ, অন্যদিকে যন্ত্রনির্ভর অগ্রবর্তী সমাজ– দুই-ই তাঁর উপন্যাসে সত্য-স্বরূপে মূর্ত। তাঁর উচ্চারিত সত্য-স্বর সমাজ- ইতিহাস, অর্থ ও শ্রেণীচেতনার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সূত্রে সংশ্লিষ্ট।

*'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'*য় রাঢ় বঙ্গে বসবাসরত একটি ক্ষুদ্র নরগোষ্ঠীর সমগ্রজীবনসত্য উপস্থাপিত হয়েছে। এদের বসবাস কোপাই নদীর মধ্যাঞ্চল হাঁসুলী বাঁকে; এবং এরা কাহার শ্রেণিভুক্ত। উপন্যাসের প্রারম্ভ পর্যায়ে এ-অঞ্চলের অবস্থান সম্পর্কে লেখকের বর্ণনাংশ সংহত ও সুস্পষ্ট :

> কোপাই নদীর প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় যে বিখ্যাত বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক– অর্থাৎ যে বাঁকটায় অত্যন্ত অল্প পরিসরের মধ্যে নদী মোড় ফিরেছে, সেখানে নদীর চেহারা হয়েছে ঠিক হাঁসুলী গয়নার মত। বর্ষাকালে সবুজ মাটিকে বেড় দিয়ে পাহাড়িয়া কোপাইয়ের গিরিমাটি-গোলা জলভরা নদীর বাঁকটিকে মনে হয়, শ্যামলা মেয়ের গলায় সোনার হাঁসুলী; কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে জল যখন পরিষ্কার সাদা হয়ে আসে– তখন মনে হয় রুপোর হাঁসুলী। এই জন্য বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক। নদীর বেড়ের মধ্যে হাঁসুলী বাঁকে ঘন বাঁশবনে ঘেরা মোটমাট আড়াই শো বিঘা জমি নিয়ে মৌজা বাঁশবাদি, লাট্ জাঙলের অন্তর্গত। বাঁশবাঁদির উত্তরেই সামান্য খানিকটা ধানচাষের মাঠ পার হয়ে জাঙল গ্রাম। বাঁশবাদি ছোট গ্রাম; দুটি পুকুরের চারি পাড়ে ঘর তিরিশেক কাহারদের বসতি। (প্রথম পর্ব : দুই)

উপন্যাসে বর্ণিত তথ্যানুযায়ী 'বাঁশবাঁদি পুরোপুরি কাহারদের গ্রাম– গ্রাম ঠিক নয়, এই জাঙল গ্রামেরই একটা পাড়া! তবে জমিদারি সেরেস্তায় মৌজা হিসেবে ভিন্ন বলে– ভিন্ন গ্রাম বলেই ধরা হয়। দুটি পুকুরের পাড়ে দুটি কাহারপাড়া। বেহারা-কাহার এবং আটপৌরে-কাহার। বেহারা-কাহারপাড়াতেই চিরকাল লোকজন বেশি, প্রায় পঁচিশ ঘর বসতি; পুব দিকে নীলের মাঠের বড় সেচের পুকুর, নীলের বাঁধের চার পাড় ঘিরে বেহারাদের বসবাস। ... বেহারাপাড়া থেকে রশিখানেক পশ্চিমে আটপৌরে কাহারদের বসতি। 'গোরার বাঁধ' বলে মাঝারি একটা পুকুরের পাড়ের উপর ঘর কয়েক আটপৌরে কাহার বাস করে। আটপৌরেরা পালকি কাঁধে করে না, ওরা বেহারাদের চেয়ে নিজেদের বড় বলে জাহির করে'। চৌধুরী বাড়ির উইয়ে-খাওয়া পুরনো কাগজের স্তূপের মধ্যে পাওয়া ১৯২৫-২৬ সালের থোকা জমাওয়াসিল সূত্রে জানা যায়, 'গোটা বাঁশবাদি মৌজাটাই ছিল পতিত ভূমি। ওখানে কোনো পুকুরও ছিল না, বসতিও না। জাঙল গ্রামে মোটমাট দশ ঘর বাস্তুর উল্লেখ পাওয়া যায়, সবাই তারা ছিল চাষী সদ্‌গোপ। ১২৫০ সালের কাগজে দেখা যায়– এক নতুন জমাপত্তন– নীলকর শ্রীযুক্ত মেস্তর জেনকিন্স সাহেবের নাম। সেই জমার মধ্যে সেই জাঙলের যাবতীয় পতিত ভূমি, তার সঙ্গে গোটা বাঁশবাঁদি মৌজাটাই প্রায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। ... বাঁশবাঁদি মৌজা

বন্দোবস্ত নিয়ে সায়েবরাই ওখানে পুকুর কাটায় এবং বাঁশবাঁদির সমস্ত পতিতকে নীলচাষের জন্য হাঁসিল করে তোলে। সেই হাঁসিল করবার জন্যই এই কাহারপাড়ার লোকেরা বাঁশবাঁদিতে আসে। এসেছিল অনেক লোক। তার মধ্যে এই কাহার কয়েক ঘরই এখানে বসবাস করে। কয়েকজন পেয়েছিল কুঠিবাড়িতে চাকরি, লাঠি নিয়ে ঘুরত ফিরত, আবার দরকারমত সাহেব মহাশয়দের ঘরদোরে কাজ করত; এজন্য তাদের জমি দেওয়া হয়েছিল, এবং এখানকার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী চব্বিশ ঘণ্টার কাজের জন্য চাকরানভোগী হিসেবে খেতাব পেয়েছিল– অষ্টপ্রহরী বা আটপৌরে। বেহারা-কাহারেরা নীলের জমি চাষ করত এবং প্রয়োজনমত সাহেব-মেমদের পালকি বইত'। কালক্রমে নীলকরদের ব্যবসায়িক বিপর্যয়ের সুযোগে তাদের সমস্ত সহায়-সম্পদ ক্রয় করে নেন তাদেরই নায়েব; বংশ পরিচয়ে যিনি ছিলেন চৌধুরী। চৌধুরী-কর্তাদের আমলেও তাদের বাড়িতে কাহাররা বেহারার কাজ করেছে, আটপৌরেরা করেছে আটপৌরের কাজ। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় প্রধানত উপস্থাপিত হয়েছে এই কাহার সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতা। কাহার-জীবনে বংশানুক্রমে প্রচলিত প্রবাদপ্রতিম সনাতন বিশ্বাস, তাদের অতীতচারী মানসপ্রবণতা এ-উপন্যাসে অসামান্য শিল্পমর্যাদায় সংগ্রথিত।

উপন্যাসের মুখচ্ছদ উন্মোচনসূত্রে জানা যায়– কোপাই-সন্নিহিত হাঁসুলী বাঁকের জাঙল গ্রামে এবং আড়াইশো বিঘা সীমানার বাঁশবাঁদি গ্রামের কাহাররা 'তরাস' কবলিত। এই 'তরাস' বা ত্রাসের কারণ–

> রাত্রে কেউ যেন শিস দিচ্ছে। দিনকয়েক শিস উঠেছিল জাঙল এবং বাঁশবাদির ঠিক মাঝখানে ওই হাঁসুলী বাঁকের পশ্চিম দিকের প্রথম বাঁকিতে– বেলগাছ এবং শ্যাওড়া ঝোপে ভর্তি, জনসাধারণের কাছে মহা আশঙ্কার স্থান ব্রহ্মদৈত্যতলা থেকে। তারপর কয়েকদিন উঠেছে জাঙলের পূর্ব গায়ে কোপাইয়ের তীরের কুলকাঁটার জঙ্গল থেকে। তারপর কয়েকদিন শিস উঠেছিল আরও খানিকটা দূরে–ওই হাঁসুলী বাঁকের দিকে সরে। এখন শিস উঠছে বাঁশবাঁদির বাঁশবনের মধ্যে কোনোখান থেকে। (প্রথম পর্ব : এক)

উপকথা-কবলিত ভীতসন্ত্রস্ত কাহার জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস– ব্রহ্মদৈত্যতলার 'কর্তা'[৩] বিশেষ কোন কারণে তাদের ওপর রুষ্ট। 'হয়ত-বা তিনিই ওই বেলবন ও শ্যাওড়া জঙ্গল থেকে বিদায় নিয়ে নদীর ধারে ধারে চলে যাচ্ছেন– শিস দিয়ে সেই কথা জানিয়ে দিয়ে চলেছেন হাঁসুলী বাঁকের অধিবাসীদের। এ নিয়ে তাদের জল্পনা-কল্পনা চলছিল'। আকস্মিক এ-বিপদপাতের কার্যকারণ নির্ণয় করতে গিয়ে তারা যখন দিশেহারা, ঠিক তখনই উপন্যাসে আবির্ভূত হয় কাহারপাড়ার 'ত্রিকালক' 'বদ্ধকালাবুড়ি সুচাঁদ কাহারনী'। সে বিবৃত করে বংশানুক্রমে প্রচলিত উপকথার রহস্যময় তথ্যসূত্র । জানা যায়–বাঁশবাঁদির বেলবন ও শ্যাওড়াবনের 'গেরুয়াপরা ন্যাড়ামাথা, রুদ্রাক্ষ ও ধবধবে পৈতাধারী' বাবা 'কালারুদ্দু'র[৪] বাহন হচ্ছে কালো অজগর। এই অজগরই শিস দিয়ে

জানিয়ে দিচ্ছে কাহারপাড়ার প্রতি তার তীব্র বিরূপতা। এ-বিরূপতার কারণ নিমতেলে পানুর সতর্কতা সত্ত্বেও 'কালারুদ্দে'র উদ্দেশে চৌধুরী কর্তৃক 'খুতো' ছাগশিশু বিসর্জন। এমতাবস্থায় রুষ্ট দেবতার রুদ্ররোষ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কাহারপল্লীর সবাই যখন প্রতিবিধান-ভাবনায় জাগ্রত, তখনই সুচাঁদ বুড়ি ঘোষণা করে দেবতা 'কালারুদ্দু'কে তুষ্ট করবার বিধান :

> আর একটি পাঁঠা তু দে পানু। আর পাড়া-ঘরে চাঁদা তুলে বাবার থানে পুজো হোক একদিন। (প্রথম পর্ব : এক)

দুঃসহ ভয় আর আতঙ্ক যখন সমগ্র কাহারপাড়াকে আমূল গ্রাস করতে উদ্যত, ঠিক তখনই উপন্যাসে আবির্ভূত হয় চিরসুন্দর করালী; কাহারপাড়ার রূপবান যুবক। 'লম্বা দীঘল চেহারা, সাধারণ হাতের চার হাত খাড়াই তাতে কোনো সন্দেহ নাই, সরু কোমর, চওড়া বুক, গোলালো পেশিবহুল হাত, সোজা পা দুখানি, লম্বা আমের মত মুখ, বড় বড় চোখ, নাকটি খাঁদা ; কিন্তু তাতেই চেহারাখানিকে করেছে সবচেয়ে মিষ্টি, তারও চেয়ে মিষ্টি তার ঠোঁট আর দাঁত। হাসলে বড় সুন্দর দেখায় করালীকে'। সে চন্দনপুরে রেলের কারখানায় কাজ করে। কথাবার্তায়, চালচলনে, আচার-ব্যবহারে সে সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র। কাহারপাড়ার প্রচল সংস্কারের মধ্যে আশৈশব বর্ধিত হয়েও সে মুক্ত-স্বাধীন চৈতন্যলোকে সুস্থির। তথাকথিত বাবা 'কালারুদ্দু'র আক্রোশ নয়, তার বিশ্বাস–কাহারপাড়ার বাতাসে ভেসে-আসা ওই শিসের উৎস অন্য কিছু। কিন্তু সে-রহস্য উন্মোচনের পূর্বেই বাঁশবাঁদির বাঁশবেড়ের গভীর অন্ধকার থেকে মর্মান্তিক আর্তনাদ করে বেরিয়ে আসে করালীর প্রিয় কুকুর কালুয়া। তার মুখ আর নাক দিয়ে গড়িয়ে আসে রক্তের ধারা। কালুয়ার এ-মর্মান্তিক পরিণতিতে আতঙ্কিত ও বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে সমগ্র কাহার জনপদ। আলোহীন অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষগুলোর মনে হয়–'কর্তা বোধ হয় খড়মসুদ্ধ বাঁ পা'টা কুকুরটার গলায় চাপিয়ে চেপে দিলেন'।

অতঃপর কাহার জনগোষ্ঠী দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন প্রত্যয়ে সমর্পিত হয়। দেবতা 'কালারুদ্দে'র অসন্তোষ সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস পায় দৃঢ়মূল বস্তুভিত্তি। কাহারপাড়ার সনাতন জীবনাদর্শের বেদীমূলে নতজানু হয় প্রাকৃত এ-জনগোষ্ঠী। করালীর প্রতি তাদের বিরূপতা অর্জন করে যৌক্তিক তাৎপর্য। তাদের নিঃসংশয় বিশ্বাস–কাহারপাড়ার বর্তমান বিপর্যয়ের জন্য দায়ী একমাত্র করালী। চিরায়ত সমাজ-সংহতিকে অস্বীকার করে সে চাকরি নিয়েছে চন্দনপুরে, ভগবান 'কালারুদ্দে'র প্রতি প্রদর্শন করেছে অসম্মান, বনওয়ারীর নেতৃত্বকে করেছে অবজ্ঞা। তাই কোশকেঁধে-বনওয়ারীর নেতৃত্বে সমগ্র কাহারপাড়া যখন করালীর দণ্ডবিধানে কৃতসংকল্প, তখনই বনওয়ারী অকস্মাৎ আবিষ্কার করে– বাঁশবাঁদির বাঁশবন ধূমাগ্নিতে সমাচ্ছন্ন। বাঁশঝাড়ের মাথা থেকে ভয়াল আগুনের লেলিহান উত্তাপে আর ধোঁয়ায় ক্লিষ্ট ও অবসন্ন হয়ে মাটিতে এলিয়ে পড়ছে একটা প্রচণ্ড সাপ– 'পাহাড়ে চিতির মত মোটা, তেমনই বিচিত্র তার বর্ণ'। বিস্ফারিত-দৃষ্টি বনওয়ারীর সামনে করালীকে দেখাচ্ছে বিজয়ী-বীরের মত দৃপ্ত ও সমুন্নত।

পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যের ঋজুতা নিয়ে সে অতঃপর যা উচ্চারণ করে তা কাহার জনপদে বিপ্লবাত্মক ও অভিনব :

> মুরুব্বি, কত্তার পুজোটা সব আমাকে দিয়ো গো। সে হা-হা করে হাসতে লাগল। (প্রথম পর্ব : দুই )

করালীর উদ্ধত ভঙ্গি আর সকৌতুক উচ্চহাস্যে স্তব্ধ, স্তম্ভিত ও বিমূঢ় হয়ে পড়ে কাহারপাড়ার আবালবৃদ্ধবনিতা। করালীর দেহসৌষ্ঠব আর ব্যক্তিত্বের সমুন্নত শোভা সন্দর্শনে চমকে ওঠে বনওয়ারী। সনাতনপন্থি প্রহ্লাদ, রতন, পানুরাও হয়ে পড়ে বাকরুদ্ধ। অকস্মাৎ কাহারপাড়ার এই বিস্ময়পূর্ণ নীরবতা চকিত হয়ে ওঠে সুচাঁদের শঙ্কাতুর কর্কশ কণ্ঠস্বরে :

> ওগো বাবাঠাকুর গো! ওরে, আমার বাবার বাহন রে! ওরে, কি হবে রে! হায় মা রে! ...ওর মাথায় চড়ে বাবাঠাকুর যে 'ভোমন' করেন। আমি যে নিজের চোখে দেখেছি রে! দহের মাথায় বাবাঠাকুরের শিমূলগাছের কোটরে সুখে নিদ্যে যাচ্ছিলেন রে আমি যে পরশু দেখেছি রে! (প্রথম পর্ব : তিন )

সুচাঁদের হৃদয়বিদারী চিৎকারে কাহারপাড়া সম্বিৎ ফিরে পায়। তারা তাদের সনাতনী ধর্মদৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করে 'বাবাঠাকুরের শিমূলগাছ, দহের মাথায় প্রাচীনতম বনস্পতি, তারই কোটরে এই আশ্চর্যজনক শিস-দেওয়া বিচিত্রবর্ণ বিষধর'। সন্দেহ নেই, এই বিশাল বিষধর চন্দ্রবোড়া বাবাঠাকুরের আশ্রিত, তাঁরই অলৌকিক বাহন । অমঙ্গল আশঙ্কায় কাহার নরনারী হয়ে ওঠে শঙ্কাতুর। এমতাবস্থায় বনওয়ারী মাতব্বর প্রতিবিধানে আগ্রহী হয়। 'প্রতিবিধান– বাবাঠাকুরের পূজা। মদে-মাংসে ঢাকে-ঢোলে আতপে-চিনিতে বস্ত্রে-সিঁদুরে পূজা'। কালরুদ্রের বিরূপতা থেকে কাহারদের রক্ষা করবার অভিপ্রায়ে এক শুভদিনে শুরু হয় পূজাপ্রদান অনুষ্ঠান :

> বাবাঠাকুরতলায় ভোরবেলায় 'ঝুঁজকি' থাকতে অর্থাৎ অন্ধকার থাকতেই ঢাকী ভোরের বাজনা ধুমূল বাজাতে শুরু করলে। রবিবার অমাবস্যা– ক্ষণ মিলেছে ভাল, বাবাঠাকুরের পুজো হবে। ফুলে বেলপাতায়, তেলে সিঁদুরে, ধূপে-প্রদীপে, আতপে চিনিতে, দুধে রম্ভায়, মদে মাংসে, কাপড়ে দক্ষিণায়– সমারোহ করে পুজো। ( প্রথম পর্ব : পাঁচ )

কিন্তু ভগবান কালরুদ্রকে তুষ্ট করবার অভিপ্রায়ে কাহারকুল বনওয়ারীর নেতৃত্বে পুজো প্রদান করলেও উত্তরোত্তর তাদের প্রাকৃত জীবনধারায় নেমে আসে বিপর্যয়। তারা অতিদ্রুত এগিয়ে যায় পরাজয় ও পতনের দিকে। করালীর সঙ্গে দ্বন্দ্বে 'আদিকালের বনস্পতি' বনওয়ারীর জীবনে নেমে আসে মর্মন্তুদ পরাভব; অবসান ঘটে বনওয়ারীর কালরুদ্রশাসিত ঐতিহ্যাশ্রিত যুগের, এবং আত্মপ্রকাশ ঘটে উদীয়মান যন্ত্রযুগের। স্পষ্টত কাহার সম্প্রদায়ের নিস্তরঙ্গ জীবনে এ-পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ কার্যকারণ করালীকর্তৃক কাহার সম্প্রদায়ের প্রচলিত বিধিবিধান অস্বীকার এবং ভগবান কালরুদ্রের বাহন চন্দ্রবোড়া সাপ পুড়িয়ে মারার মত ভয়ংকর ঘটনা হলেও এর পরোক্ষ

কারণরূপে নিঃসন্দেহে সক্রিয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তেরোশ পঞ্চাশের বন্যা প্রভৃতি বহিরারোপিত ঘটনার অনিবার্য প্রভাব। '... দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব-প্রতিক্রিয়াই হাঁসুলী বাঁকের উপকথা-নিয়ন্ত্রিত নিস্তরঙ্গ কাহার-জীবনধারায় রোপণ করেছে বিনষ্টির বীজ। যুদ্ধের দামামাই নগদ অর্থ উপার্জনের প্রলোভনে আকৃষ্ট করে কাহারদেরকে দিনমজুরে পরিণত করেছে, যুদ্ধের রসদ যোগানোর অনিবার্যতায় নিশ্চিহ্ন হয়েছে বাঁশবাঁদির বাঁশবন। ফলত, স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে কাহারকুল ; বুর্জোয়া-ধনতান্ত্রিক সমাজের অজগরতুল্য জঠরের আকর্ষণে বাস্তুহারা-সংস্কৃতিহারা কৃষক-কাহার রূপান্তরিত হয়েছে যন্ত্রকলের শ্রমদাসে। কৃষির উপর যন্ত্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যে ইতিহাস সামাজিক-রূপান্তরের ইতিহাসসংলগ্ন– ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর সেই সামাজিক ইতিহাসকেই সমকালীন বিশ্ব-রাজনীতির এক ভয়ঙ্কর অভিব্যক্তি– দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে বিশেষ একটি অঞ্চলের প্রত্নকাহিনী-শাসিত সম্প্রদায়ের জীবনকথায় প্রতীকায়িত করেছেন।'[৫]

*হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়* বনওয়ারী-করালীর দ্বন্দ্বের পরিণামে বনওয়ারীর পরাভব এবং করালীর স্পর্ধিত উত্থান মৌল প্রতিপাদ্যরূপে প্রদর্শিত। করালী-বনওয়ারীর এই দ্বন্দ্ব সামাজিক ইতিহাসের রূপ-রূপান্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও এ-উপন্যাসে তারাশঙ্কর জীবনের যে ভূগোল নির্বাচন করেছেন, তা আঞ্চলিক-বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। উপন্যাসটি আঞ্চলিক বিষয়গৌরবে সমৃদ্ধ। স্মর্তব্য, যে-কারণে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) *আরণ্যক* (১৯৩৯) এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬) আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, সে-কারণে *হাঁসুলী বাঁকের উপকথাও* আঞ্চলিক উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত। 'আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য এই উপন্যাসে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে– ১. একটি বিশিষ্ট পরিবেশ- ধৃত জনগোষ্ঠীর সামূহিক বিশ্বাস– বিশেষ সেই গোষ্ঠী সৃষ্টি এবং ইতিবৃত্ত সম্বন্ধীয় বহুকালাগত স্মৃতি ; ২. তাদের জীবিকার সার্বিক পরিচয়; ৩. তাদের অসংস্কৃত অনুভূতির রূপায়ণের ঔপভাষিক বৈশিষ্ট্য। এর সঙ্গে আর একটি যোগ করা যায়– যা প্রায় প্রধান আঞ্চলিক উপন্যাসেই দেখা যায়– বৃহত্তর দেশকালের হস্তক্ষেপে আঞ্চলিকতা ভেঙে যাচ্ছে।'[৬]

কোপাই নদীর মধ্যাঞ্চল হাঁসুলী বাঁকের সন্নিহিত কাহার জনপদের স্থানিক বর্ণিমা এবং তাদের আচরণ-বিচরণ, অর্থাৎ local color and habitations এই উপন্যাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করেছেন। উপন্যাসের প্রথম পর্বের প্রথম পরিচ্ছেদে এ-অঞ্চলের স্থানিক বর্ণিমার যে চিত্রায়ণ ঘটেছে, তা অপরাপর অঞ্চলের তুলনায় এ-অঞ্চলকে প্রদান করেছে লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্য। পূর্ববঙ্গের ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা-প্রতিতুলনায় এই পরিচ্ছেদে কোপাই নদী ও বাঁশবাঁদি গ্রামের যে বিশেষত্ব পরিস্ফুটিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক :

> ...হাঁসুলী বাঁকের দেশ আলাদা। হাঁসুলী বাঁকের দেশ কড়াধাতের মাটির দেশ। এ দেশের নদীর চেয়ে মাটির সঙ্গেই মানুষের লড়াই বেশি। 'খরা' অর্থাৎ প্রখর গ্রীষ্ম উঠলে নদী শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যায়, ধুধু করে বালি– এক পাশে মাত্র এক হাঁটু গভীর জল কোনোমতে বয়ে যায়– মা-মরা ছোট মেয়ের মত শুকনো মুখে দুর্বল শরীরে, কোনোমতে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে। মাটি তখন হয়ে ওঠে পাষাণ; ঘাস যায় শুকিয়ে, গরম হয়ে ওঠে আগুনে-পোড়া লোহার মত; কোদাল কি টামনায় কাটে না, কোপ দিলে কোদাল-টামনারই ধার বেঁকে যায়; গাঁইতির মত যে যন্ত্র সে দিয়ে কোপ দিলে তবে খানিকটা কাটে, কিন্তু প্রতি কোপে আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ে। খাল বিল পুকুর দিঘি চৌচির হয়ে ফেটে যায়। তখন নদীই রাখে মানুষকে বাঁচিয়ে; জল দেয় ওই নদী। নদীর ভাবনা এখানে বার মাসের নয়।

গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহে যে জনপদ হয়ে ওঠে রুক্ষ ও রূঢ়, সেখানে প্রাণের স্পন্দন নিয়ে আসে কোপাই ; জলদানে তুষ্ট করে কাহার নরনারীকে। যে নদী উদার সহমর্মিতা প্রদর্শন করে নিদাঘ-তপ্ত দিনগুলোয়, সে-নদীই ভিন্নরূপে আবির্ভূত হয় বর্ষাঋতুতে। প্রাসঙ্গিক বর্ণনাংশ লক্ষণীয় :

> নদীর ভাবনা এখানে চার মাসের। আষাঢ় থেকে আশ্বিন। আষাঢ় থেকেই মা-মরা ছোট মেয়ের বয়স বেড়ে ওঠে। যৌবনে ভরে যায় তার শরীর। তারপর হঠাৎ একদিন সে হয়ে ওঠে ডাকিনী।... ক্ষমা নাই– ঘেন্না নাই, দিগম্বরীর মত হাঁক ছেড়ে, ডাক পেড়ে, শত মুখে কলকল খলখল শব্দ তুলে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটে। গ্রাম বসতি মাঠ শ্মশান ভাগাড়, লোকের ঘরের লক্ষ্মীর আসন থেকে আস্তাকুঁড়– যা সামনে পড়ে মাড়িয়ে তছনছ করে দিয়ে চলে যায়। সেও এক দিন দুদিন। বড়জোর কালে-কস্মিনে চার-পাঁচ দিন পরেই আবার সংবিৎ ফেরে। কাহারদের মেয়েও যেমন রাগ পড়লে এসে চুপ করে গাঁয়ের ধারে বসে থাকে, তারপর এক পা দু পা করে এসে বাড়ির কানাচে শুয়ে গুনগুন করে কাঁদে কি গান করে, ঠিক ধরা যায় না– তেমনই ভাবে কোপাইও দুদিন বড়জোর চার দিন পরে আপন কিনারায় নেমে আসে, কিনারা জাগিয়ে খানিকটা নিচে নেমে কুলকুল শব্দ করে বয়ে যায়। চার মাসের মধ্যে এমনটা হয় পাঁচ বার কি সাত বার, তার বেশি নয়। তার মধ্যে হয়ত একবার , কি দু-তিন বৎসরে এক বার ক্ষ্যাপামি করে বেশি। কোপাই নদী ঠিক যেন কাহার-কন্যে। ( প্রথম পর্ব : এক )

প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *পুনশ্চ* কাব্যগ্রন্থের 'কোপাই' কবিতার কয়েকটি চরণের নিহিতার্থ লক্ষণীয়, উপর্যুক্ত বর্ণনাংশের সঙ্গে যার সাযুজ্য বিস্ময়কর :

> বর্ষায় ওর অঙ্গে অঙ্গে লাগে মাতলামি
> মহুয়া মাতাল গাঁয়ের মেয়ের মতো–

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবর্তের ঘাঘরা
ভাঙে না, ডোবায় না,
দুই তীরকে ঠেলা দিয়ে দিয়ে
উচ্চ হেসে ধেয়ে চলে।

বর্ষাকালে কোপাইয়ের বন্যায় এতদঞ্চলের বাস্তুভিটা, ঘরদোর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না একথা সত্য, কিন্তু অকল্পনীয় উপদ্রব বেড়ে যায় মশা-মাছির ; শুরু হয় ম্যালেরিয়া :

> ... কোপাইয়ের বন্যায় ঘরদোর না ভাঙলেও ভুগতে হয় বৈকি। জল সরে গেলে ভিজে মাটি থেকে ভাপ উঠতে আরম্ভ করে– মাছিতে মশাতে ভরে যায় দেশ। মানুষ চলে, মানুষের মাথার উপর ঝাঁকবন্দি মশা সঙ্গে চলে ভনভন শব্দ তুলে, মানুষের শরীর শিউরে ওঠে, তাদের কামড়ে অঙ্গ দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলে ওঠে। গরুর গায়ে মাছি বসে থাকে চাপবন্দি হয়ে, লেজের ঝাপটানিতে তাড়িয়ে কুলিয়ে উঠতে না পেরে তারা অনবরত শিং নাড়ে, কখনও কখনও চার পা তুলে লাফাতে থাকে। ... এর কিছুদিন পরেই আরম্ভ হয় 'মালোয়ারী'র জ্বর। (প্রথম পর্ব : এক )

কখনও কখনও কোপাইয়ে নেমে আসে আকস্মিক বন্যা। এই বন্যায় সাঁওতাল পরগনা, বিশেষত, বাঁশবাঁদিতে সূচিত হয় অনাকাঙ্ক্ষিত উপদ্রব :

> সাঁওতাল পরগনার পাহাড়িয়া নদী কোপাইয়ে ওই দু-তিন বৎসর অন্তর যে আকস্মিক বন্যা আসে যাকে বলে হড়পা 'বান', সেই বন্যার স্রোতে পড়ে ক্বচিৎ কখনও একটা-দুটো 'গুলবাঘা' ভেসে এসে হাঁসুলী বাঁকের এই খাপছাড়া বাঁকে, বাঁশবাঁদি গাঁয়ের নদীকূলের বাঁশবনের বেড়ার মধ্যে আটকে যায়। কখনও মরা, কখনও জ্যান্ত। জ্যান্ত থাকলে বাঘা এই বাঁশবনেই বাসা বাঁধে। আর আসে ভালুক; দুটো-একটা প্রতি বৎসরেই আসে ও-বেটারা। ... জ্যান্ত বাঘ কদাচিৎ আসে, মরাও ঠিক তাই। গোটা এক পুরুষে দুটো এসেছে– একটা মরা, একটা জ্যান্ত। ... আর এখানেই আছে বুনো শুয়োর, কাহারদের লাঠিসোঁটা খোঁচা বল্লম সত্ত্বেও এখানে বুনো শুয়োরের একটা দস্তুরমত আড্ডা-আড়ত গড়ে উঠেছে।...
>
> আর আসে মধ্যে মধ্যে কুমির। প্রায়ই সব মেছো কুমির। কুমির এসে জাঙলের বাবু-ভাইদের মাছ-ভরা পুকুরে নামে। সে আর উঠতে চায় না। ...
>
> তবে হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাঁদির ঘাটের পাশে যে দহটা আছে, সেখানে আসে সর্বনেশে মানুষ-গরু-খেকো বড় কুমির– এখানকার লোকে বলে 'ঘড়িয়াল'। (প্রথম পর্ব : এক )

*হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* উপন্যাসে কাহারকুলের জীবন-জীবিকার প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে বিস্তৃত পরিসরে। জ্ঞাত ইতিহাসের একটি পর্যায়ে কাহাররা ছিল ইংরেজ নীলকরদের চাকরানভোগী। তারা নীলের জমি চাষ করত, এবং প্রয়োজনমত

সাহেব-মেমদের পালকি বহন করত। চৌধুরীকর্তাদের আমলেও কাহাররা একই কাজ করেছে। কালপ্রবাহে তাদের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্র কীভাবে ক্রমসংকুচিত হতে থাকে, তা উপন্যাসে পরিবেশন করেছেন তারাশঙ্কর। বদ্ধকালাবুড়ি সুচাঁদের স্মৃতি-উৎসারিত প্রাসঙ্গিক বর্ণনাংশ লক্ষণীয় :

> সায়েবদের আমলে দুখানা পালকি, কুঠিতে চব্বিশ ঘণ্টা হাজির থাকতে হত, ষোল জন বেহারা মোতায়েন থাকত। সায়েবরা ফি বেহারাকে জমি দিয়েছিল দশ বিঘে করে আর বাস্তুভিটে। তার ওপর 'বশকিশ' ছিল, হেথা-হোথা বিয়েশাদির বায়না ছিল। আরও ছিল...নীলের চাষ। তাও সবাই খানিক আধেক দু বিঘে পাঁচ বিঘে করত।... যখন দাঙ্গা হত– এই ধর কোনো 'ভদ্দশুদ্দুদের' জমির ধান ভেঙ্গে নীল বুনতে হত, কি পাকা ধান কেটে নিতে হত তখন কাহারেরা ছিল সায়েব মশায়দের ডান হাত। ... ওই আটপৌরেরাও লেঠেলদের সঙ্গে লাঠি নিয়ে যেত। তারা পাহারা দিত, আর বেহারা-কাহারেরা হাল গরু নিয়ে দিত পোঁতা জমি ভেঙে, চষেমষে তছনছ করে নীল বুনে দিত, পাকা ধান হলে কেটে-মেটে ছিঁড়ে-খুঁড়ে তুলে নিয়ে চলে আসত বাড়ি। ধান যে যা আনত সে তো পেতই, তার ওপর ছিল লগদ লগদ 'বশকিশ'। সে ছিল কাহারদের সোনার আমল। সায়েবরা গেল, কাহারদের কপাল ভাঙল।...চৌধুরী বেবাক চাকরান জমি খাস করে নিয়েছে এখন। ...জমি বাড়ি ঘর সব গেল।... শেষকালে 'নউমী' পুজোর দিনে সে এক অবাক কাণ্ড! হঠাৎ চৌধুরী বললে– যা ভিটেগুলো তোদের ছেড়ে দিলাম, ভিটে থেকে তোদের বাস তুলেল দোব না, সে বজায় রাখলাম। ওই চাকরানটুকু রইল, কালে-কস্মিনে পালকির দরকার হলে বইতে হবে। তবে জমি পাবি না। (প্রথম পর্ব : পাঁচ )

হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাঁদি গ্রামের কাহারদের সমাজকাঠামো পুরুষতান্ত্রিক। এখানে পুরুষরাই পালন করে পরিবার-প্রধানের ভূমিকা। জীবিকার্জনে নারীসমাজের ভূমিকাও নগন্য নয়। কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের সহযোগী হয়ে এগিয়ে আসে কাহার-নারী। 'কাহার-বুড়িরা, প্রবীণরা, যারা মজুরনী খাটতে পারেনা, তারাও বসে খায় না– পিতৃপুরুষের নিয়ম এই, যেমন গতর তেমনই খাটতে হবে। তারা দুপুরবেলা গরু-বাছুর-ছাগলের জন্য ঘাস কাটতে যায়। কাঁখে ঝুড়ি নিয়ে, কাস্তে নিয়ে চলে যায় হাঁসুলীর বাঁকের ওপারে– কোপাইয়ের অপর পারে গোপের পাড়ায় 'মোষদহরীর বিলে ঘাস কাটতে। মস্ত বিলটার চারিপাশে প্রচুর ঘাস জন্মায়। তার সঙ্গে পানিফল তুলে আনে, লমি শুষনি শাক সংগ্রহ করে, আর দু-চারটে পাঁকাল মাছ– তাও ধরে আনে'।(প্রথম পর্ব : তিন )

কৃষিকর্মই কাহারদের প্রধান জীবিকার উৎস হলেও তারা জোতজমিহীন। জাঙলের সদগোপদের জমিতে তারা চাষাবাদ করে; ধান, গম, সরষে আলু, কধাধই, আখ এবং নানাবিধ তরিতরকারি উৎপাদন করে। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে তারা যে ফসল উৎপাদন

করে, তাতে সাংবৎসরিক আহার্য জোটে না; মানবেতর জীবনযাপনে তারা বাধ্য হয়। 'তারা মনিবের ক্ষেতে খেটে খায়; ফসলের তিন ভাগের এক ভাগ পায়, তাও ছ মাস খেতে-খেতেই ফুরিয়ে যায়– বাকি ছ মাস মনিবের কাছে 'দেড়ীতে ধান নেয়, বেচবার মত ধান চাল তাদের নাই। বেচেও না, কেনেও না। বাড়ির কানাচে শাকপাতা হয়, পুকুরে বিলে নালায় নদীতে শামুক গুগলি আছে– ধরে নিয়ে আসে। কয়লার দাম চড়ে; কাহারেরা জীবনে কখনও কয়লা পোড়ায় না, নদীর ধারে ঝোপজঙ্গল থেকে কাঠকুটো কুড়িয়ে আনে; গরুর গোবর ঘেঁটে ঘুঁটে দেয়, তার দু-চারখানা নিজেরা পোড়ায়– বাকি বিক্রি করে চন্দনপুরে জাঙলে। কাপড়ের দর চড়লে কষ্ট বটে। তাই-বা কখানা কাপড় তাদের লাগে? পুরুষদের তো চাষের সময় ছ মাস অর্ধেক দিন গামছা পরেই কাটে। বাকি অর্ধেক দিন– ছ হাত মোটা কাপড় পরে।' ( দ্বিতীয় পর্ব : চার )

*হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*-য় বর্ণিত হয়েছে বিচিত্র উৎসব-পার্বণ প্রসঙ্গ। এসবের মাধ্যমে প্রাকৃত এ-জনগোষ্ঠী নিজেদের রুদ্ধ ও বদ্ধ জীবনপরিবেশে তৈরি করে খণ্ড-খণ্ড আনন্দের ভুবন ; অন্ধকার জীবনপরিসরে সন্ধান করে এক ঝলক আলোকরশ্মির। প্যাঁচা-ঝিঁঝি-ভূত-তক্ষক-পেত্নী-শাঁকচুন্নি আর দারিদ্র্যঘেরা অনগ্রসর এই জনপদে এ-আনন্দ তাদের কাছে এক-একটি স্বর্গখণ্ডের মত। 'ছেলে-ছোকরারা ঢোল বাজিয়ে কখনও গায় ধর্মরাজের বোলান, কখনও গায় মনসার ভাসান, ভাদ্রমাসে ভাদু-ভাঁজোর গান, আশ্বিনে মা দশভুজার পুজোয় পাঁচালি, কার্তিক থেকে মাঘ-ফাল্গুন পর্যন্ত শীত– তখন গানবাজনার আসর আসে ঢিমিয়ে, ধান-কাটা ফসল তোলার সময়। চৈত্রে আবার নতুন করে আসর বসে– ঘেঁটুর গান, সংক্রান্তির কাছাকাছি বসে গাজনের, বোলানের গানের পালা।

মাঝে মাঝে এরই মধ্যে আসে দু-দশটা রাত্রি, যার সঙ্গে অন্য সকল রাত্রির কোনো মিল নাই। বিয়েশাদির রাত্রি, আর বার মাসে বারটা পূর্ণিমা কি 'চতুকদশী'র রাত্রি, তার মধ্যে আষাঢ়-শাঙন-ভাদরের 'ডাউরি' অর্থাৎ বাদল-লাগা পূর্ণিমা 'চতুকশশী' বাদ। বাকি পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নার আলো ঝলমল করে। সেই কয়েকটা রাত্রে আমোদ লাগে, একদিকে আলো অন্যদিক অন্ধকার– বাঁশবনের আদ্যিকালের অন্ধকার সেই কয়েকদিন ঘুমিয়ে থাকে বাঁশতলার জট-পাকানো শিকড়গুলোর মধ্যে, কত কালের ঝরা বাঁশপাতার বিছানায়।' (দ্বিতীয় পর্ব : চার )

এই উপন্যাসে ঘেঁটু ও ঝুমুর দল প্রসঙ্গে একটি বর্ণনাংশ নিম্নরূপ :

> কাহারপাড়ায় এইবার ঢোলের বাজনা থামবে। এ ঢোল বায়েনদের বাজনা নয়। সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে আদ্যিকালের অন্ধকার মিশে যে অন্ধকার নামে কাহারপাড়ায়– তার প্রভাব থেকে বাঁচবার জন্য যে একঘেয়ে গানবাজনার আসর বসে ওদের, সেই গানবাজনার আসরের ঢোল। চৈত্র মাসে আসছে ঘেঁটুগানের পালা। তারই উদ্যোগ পর্ব চলছে। একটা ঢোল থামল। এখনও দুটো ঢোল বাজছে। বাঁশবাঁদিতে তিনটে ঘেঁটুর দল। একটা কাহারপাড়ার

> পুরনো দল, একটা আটপৌরে-পাড়ার, এর উপর বছর দুই হল করালী একটা নতুন দল করেছে। করালীর দলে নসুদিদি আছে– সে নাচে কোমর ঘুরিয়ে ঝুমুর দলের মেয়ের মত। করালী একটা বাঁশের বাঁশি কিনেছে, সে সেটা বাজায়। ও দলের এখন চলতি খুব। গান বেঁধে নিয়ে আসে চন্দনপুরের মুকুন্দ ময়রার কাছ থেকে। নতুন রকমের গান। (দ্বিতীয় পর্ব : চার )

কাহার সম্প্রদায়ের প্রেম-প্রণয় এবং বিবাহ প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে এ- উপন্যাসের বেশ কয়েকটি এলাকায়। নরনারীর ভালবাসাকে কাহাররা বলে 'অঙ' (রঙ)। এই অঙের জন্য কাহার- মেয়েরা ঘর ছাড়তেও দ্বিধা করে না; সামাজিক অঙের জন্য তো বটে, অসামাজিক অঙের জন্যও। 'ওদের এতে লজ্জা নাই। ভালবাসলে, সে ভালবাসা লজ্জা বল, ভয় বল, পাড়া-পড়শীর ঘৃণা বল, কোনো কিছুর জন্যই ঢাকতে জানে না কাহারেরা। সে অভ্যাস ওদের নাই, সে ওরা পারে না। সেই কারণেই মধ্যে মধ্যে কাহারদের তরুণী মেয়ে বানভাসা কোপাইয়ের মত ক্ষেপে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে পথে দাঁড়ায়।' কাহারদের জ্ঞাত ইতিহাসের প্রথম পরিচ্ছেদে দেখা যায়, কাহার-কন্যাদের সঙ্গে নীলকুঠির সায়েবদের গড়ে উঠেছিল অসামাজিক অঙের সম্পর্ক। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চৌধুরীরা তাদের ইন্দ্রিয়জ লালসা চরিতার্থ করবার জন্য অবলীলায় ব্যবহার করেছে কাহার-কন্যাদের। উপন্যাসের একটি প্রাসঙ্গিক বর্ণনাংশ লক্ষণীয় :

> ... নীলের জমি সেচ করবার জন্য পুকুরটা কাটানো হয়েছিল বলে ওটার নাম 'নীলের বাঁধ', আর 'গোরার বাঁধ' নামটা হয়েছে 'গোরা' অর্থাৎ সাহেবদের বাঁধ বলে। পুকুরটার জল ভাল– ওই পুকুরে সেকালে কারও নামবার হুকুম ছিল না, ওখান থেকেই যেত সাহেবের ব্যবহারের জল, মধ্যে মধ্যে কুঠিয়াল সাহেবের কাছে সমাগত বন্ধুবান্ধব গোরা সাহেবেরা এসে স্নান করতে নামত। স্নান করত নাকি উলঙ্গ হয়ে। সেই আমল থেকে কাহারদের কয়েকটা ঘরে রূপ এসে বাসা বেঁধেছে। পরম কাহারদের গুষ্টিটার রঙই সেই আমল থেকে ধবধবে ফরসা। সুচাঁদপিসির কর্তাবাবা অর্থাৎ বাবার বাবার রঙ একেবারে সাহেবের মত ছিল। সুচাঁদপিসির রঙও ফরসা। মেয়ে বসন্ত খুব ফরসা নয়। কিন্তু ওর মেয়ে পাখী তো একেবারে 'হলুদমণি' পাখি ; চৌধুরী-বাড়ির কর্তার ছেলে অকালে মরে গেল মদ খেয়ে, নইলে যুবতী পাখীর এখনকার মুখের সঙ্গে তার মুখের আশ্চর্য মিল দেখা যেত। তেমনিই বড় বড় চোখ, তেমনিই সুডৌল নাক, চুলের সামনেটা পর্যন্ত তেমনিই ঢেউ-খেলানো। (প্রথম পর্ব : এক )

উপন্যাসে বনওয়ারীর সঙ্গে কালোশশীর প্রেমচিত্রও পরিবেশ-প্রতিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত করে অঙ্কন করেছেন তারাশঙ্কর। স্ত্রী গোপালীবালার সঙ্গে সুখী দাম্পত্যজীবন যাপন করলেও কালোশশীর প্রতি এখনও দুর্মর আকর্ষণ বোধ করে বনওয়ারী। বনওয়ারীর সঙ্গে অবৈধ প্রেম উদযাপন করতে গিয়ে পরমের স্ত্রী কালোশশী কীভাবে

দহের জলে গোখুরো সাপের দংশনে আত্মাহুতি দিয়েছে , তা উপন্যাসে পরিবেশিত হয়েছে করুণ-রসাত্মক ভঙ্গিতে। তদুপরি নব্যকালের প্রতিনিধি করালীর সঙ্গে পাখী এবং সুবাসীর প্রণয় ও বিবাহ-সম্পর্ক এই উপন্যাসের পৃথক দুই কৌতূহলোদ্দীপক প্রসঙ্গ।

*হাঁসুলী বাঁকের উপকথার* চরিত্রসমূহ বিবর্তনশীল সময় ও সমাজের পটভূমিতে অঙ্কিত। কাহারদের চিরান্ধকার জীবনাবর্তের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি বনওয়ারী; যিনি কৌম জীবন ও সমাজ-সংহতির প্রতি আমূল সমর্পিত। পক্ষান্তরে করালী হচ্ছে নবজীবনের উদ্বোধক। যুগ-যুগান্তরব্যাপী কাহারপল্লিতে প্রচলিত সনাতন প্রথা-পদ্ধতির প্রতি তার প্রবল বিতৃষ্ণা। বনওয়ারী-করালীর দ্বন্দ্বে কাহারপল্লিতে করালীর শক্তি ও স্বস্তি পরিশেষে হয়ে ওঠে অনিবার্য ও মাননীয়। সে উদ্দেশ্য সাধন ও বাস্তবায়নে একাগ্রচিত্ত। কাহার জনগোষ্ঠীর অযৌক্তিক সংস্কারের প্রতি তার তীব্র অশ্রদ্ধা। তার আঘাতে-প্রতিঘাতে কাহারদের কৌম জীবনে ভাঙন হয়ে ওঠে স্পষ্ট।'করালী নতুন কালের নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধি হয়ে প্রতিবাদী ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রবীণদের মতো 'বিধির বিধান' বলে কোনো ধরনের অভ্যাসকে সে মেনে নেয়না; সাংস্কৃতিক বীক্ষণ ও সামাজিক সম্পর্ক– সর্বত্র সে বইয়ে দিতে চায় প্রতিস্রোতের ঔদ্ধত্য।'[৭] অন্যদিকে বনওয়ারী পিতৃপিতামহের আচরিত বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রতি আমূল বিশ্বস্ত। যুগ-যুগান্তরের বহমান যুক্তিহীন প্রাচীন প্রথাকে সে আঁকড়ে ধরে প্রবলভাবে। করালীর সঙ্গে বনওয়ারীর এ দ্বন্দ্ব নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব। কাহার পল্লির চিরাগত সংস্কার লালন ও উদযাপনের দুর্মর প্রতিজ্ঞায় জাগ্রত হয়েও সময়ের দাবিতে চিরসুন্দর করালীর কাছে বনওয়ারীর ঘটে নির্মম পরাভব। বনওয়ারীর এই পরাভব উপন্যাসে তৈরি করেছে এক ধরনের ট্রাজিক সংরাগ। সনাতনপন্থী বনওয়ারীর প্রতি তারাশঙ্করের এই সংবেদনা তাঁর শিল্পভাবনার স্বাভাবিক অনুষঙ্গ। 'বস্তুত প্রাচীনের প্রতি অন্তরের এই নিগূঢ় আকর্ষণ তারাশঙ্করের প্রতিক্রিয়াশীল কুসংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গির নিদর্শন নয়, বাস্তববাদী তারাশঙ্করের গভীর ঐতিহ্যপ্রীতির পরিচায়ক।[৮]

*হাঁসুলী বাঁকের উপকথার* নায়ক জন্ম-মৃত্যু-আয়ুষ্কালশাসিত রক্তমাংসময় কোনো চরিত্র নয়। 'উপন্যাসটির ঘটনা, চরিত্র, বর্ণনা, সংলাপ ইত্যাদিতে পরিবেশের অন্তর্লীন প্রভাব এত প্রবল ও পরিব্যাপ্ত যে কাহারদের নিজস্ব সংস্কার, বোধ, প্রথা, উৎসব, অবসরযাপন, আমোদ, আবেগ, সমন্বিত জীবনযাত্রা এই চৌহদ্দির বাইরে কল্পনা করা যায় না। বলা চলে যে হাঁসুলী বাঁকের প্রকৃতি ও তার কোলে লালিত বাঁশবাঁদি গ্রামের ক্ষুদ্র কাহার সমাজই *হাঁসুলী বাঁকের উপকথার* প্রকৃত নায়ক।[৯] 'বদ্ধকালাবুড়ি সুচাঁদ কাহারনী', পাখী, সুবাসী, কালোশশী, গোপালীবালা, রতন, পরম, নিমতেলে পানু, গুপী, নসুবালা, নটবর, প্রহ্লাদ, নয়ান প্রত্যেকটি চরিত্র কাহারপল্লির গতানুগতিক জীবনের অনুবর্তী। এসব চরিত্রের মাধ্যমে প্রতিবিম্বিত হয়েছে কাহারজীবনের ধর্ম, ধর্মাচার, রীতি-নীতি, সংস্কার-সংস্কৃতি, জীবন-জীবিকার নিখাদ চালচিত্র। সমস্যা,

সংকট ও সংস্কারের আবিল আবর্তে ঘূর্ণ্যমান এসব চরিত্র কাহারদের চিরান্ধকার জীবন-বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

*হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* উপন্যাসে তারাশঙ্কর হাঁসুলী বাঁক অধ্যুষিত কাহার জনগোষ্ঠীর যাপিত জীবন ও পরিবেশ-প্রতিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে এই উপন্যাসের ভাষা নির্মাণ করেছেন। কাহারদের সমাজ-সংস্কৃতি উপস্থাপনে এ-ভাষা নিঃসন্দেহে অনুকূল ও বিশ্বস্ত। বীরভূমের একটি অনার্য ভূ-অঞ্চলের লৌকপুরাণিক যে-গাথা তিনি রচনা করেছেন, তার জন্যে এর বিকল্প অন্য কোনো ভাষা অকল্পনীয়। একটি দৃষ্টান্ত :

> ... হাঁসুলী বাঁকের মানুষেরা, নরনারীর ভালবাসাকে বলে'রঙ'। রঙ নয়– বলে 'অঙ'। ওরা রামকে বলে 'আম', রজনীকে বলে 'অজুনী', রীতকরণকে বলে 'ইতকরণ', রাতবিরেতকে বলে 'আতবিরেত'। অর্থাৎ শব্দের প্রথমে র থাকলে সেখানে ওরা র-কে অ করে দেয়। নইলে যে বেরোয় না জিভে, তা নয়। শব্দের মধ্যস্থলের র দিব্যি উচ্চারণ করে। মেয়ে-পুরুষের ভালবাসা হলে ওরা বলে– অঙ লাগায়েছে দুজনাতে। (প্রথম পর্ব : এক )

*হাঁসুলী বাঁকের উপকথার* প্রাক্-সমাপ্তি পর্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে ১৯৪৩ সালের বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস-প্রসঙ্গ। এতে রেললাইন ভেসে যায়; ভেসে যায় হাঁসুলী বাঁকের উপকথা ও তার পটভূমি। উপকথার ছোট নদী মিশে যায় ইতিহাসের বড় নদীতে। কাহারেরা ধুলো-কাদা, লাঙল-কাস্তের পরিবর্তে প্রাপ্ত হয় তেল-কালি, হাম্বর- শাবল-গাঁইতি। চন্ননপুরের পাকা ঘুপচি কোয়ার্টার্সে তাদের দিন কাটে অনাহার-অর্ধাহারে। করালীর সঙ্গে দ্বন্দ্বে বনওয়ারীর করুণ জীবনাবসান ঘটে। ইতিহাসের নিয়মে নবীনের কাছে পরাস্ত হয় প্রবীণ। কৌম জীবনের অবসান ঘটে। তবু অতীতের মোহ পরোপুরি তাদের চেতনালোক থেকে লুপ্ত হয়না। কাহার পাড়া এখনও তাদের প্রলুব্ধ করে। বাঁশবাঁদির বাঁধের বেড়ে বালি ঠেলে বাঁশের কোঁড়া বেরোয়। কচি কচি ঘাস জেগে ওঠে। ঐতিহ্যসন্ধানী তারাশঙ্করের শিল্পীচৈতন্য করালীকে নিয়ে আসে বাঁশবাঁদিতে। দেখা যায়, করালী 'সাবল হাতে গাঁইতি চালাচ্ছে, বালি কাটছে, আর মাটি খুঁজছে। উপকথার কোপাইকে ইতিহাসের গঙ্গায় মিশিয়ে দেবার পথ কাটছে। নতুন হাঁসুলী বাঁক।' স্পষ্টত হাঁসুলী বাঁকে কৌম জীবনবোধ, সংস্কৃতি, বিচারবোধ ধ্বস্ত হলেও তারাশঙ্কর তার সম্পূর্ণ অবসান চাননি। 'তাই পরিবর্তনের বিপ্রতীপে অবস্থিত বনোয়ারীর মৃত্যুর পরে স্বয়ং করালী তাকে মর্যাদা দেয় শালকাঠের চিতা রচনা করে। পুরোনো অবসংগঠনের ভাঙন সত্ত্বেও বিদ্রোহী নতুনের মধ্যে তার রেশ থেকে যায় : এই বিশ্বাস থেকে তারাশঙ্কর সরে আসেননি কখনো। উপন্যাসের গ্রন্থনায় তার সূক্ষ্ম প্রভাব লক্ষ করি বারবার।[১০]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুদ্ধ ও শীলিত শিল্পীচৈতন্যের অমর বাহন *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*। সমাজ, ইতিহাস ও শিল্পের মিলিত সমবায়ে এই উপন্যাসে সৃজিত হয়েছে এক বিস্ময়কর ভুবন। 'আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তারাশঙ্করের বস্তুজ্ঞান ও

বিষয়বোধ। ঐ আঞ্চলিক পটভূমির অনুপুঙ্খ সম্বন্ধে জ্ঞান, ভূমিব্যবস্থার এবং গ্রামীণ আর্থনীতিক প্যাটার্নের সঠিক চিত্র অঙ্কন ইত্যাদি এই উপন্যাসের সার্বিক পরিবেশকে জমাট করে তুলেছে। তা এত জমাট যে, এই উপন্যাসের কোনোটি থেকে কোনটিকে পৃথক করা যায় না। এমনকি মহৎ ঔপন্যাসিকের মতোই তারাশঙ্কর দেশজ বাগ্‌রীতির উপর তাঁর আশ্চর্য অধিকারকে শুধু সপ্রমাণ করেননি, তাকে শিল্পশুদ্ধ করে তুলেছেন।'[১১] একটি বিশেষ অঞ্চলের প্রতিফলক হওয়া সত্ত্বেও পরিশেষে এটি হয়ে উঠেছে চিরায়ত জীবন-উপলব্ধির স্মারক ; অবিস্মরণীয় মহাকাব্য।

**তথ্যপঞ্জি :**


১. বিনয় ঘোষ, 'তারাশঙ্করের সাহিত্য ও সামাজিক প্রতিবেশ', *শনিবারের চিঠি*, তারাশঙ্কর সংখ্যা (সম্পা. রঞ্জনকুমার দাস), নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ.৬০-৬১

২. সংস্কৃত স্কন্ধকার থেকে কহার বা কাহার নামের উৎপত্তি। কাহার বলে কোন নির্দিষ্ট জাতি বাংলাদেশে নেই, হরিজন যাদের বলি আমরা, এদের মধ্যে যারা পাল্কী বয়ে থাকে তারাই বাংলাদেশে কাহার। ...১৯১১ খৃস্টাব্দে বাংলাদেশে এদের সংখ্যা ছিল ৮৯৬৯৪। (দ্রষ্টব্য: রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর ও রাঢ়-বাংলা, নবার্ক, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৮৮)

৩. রাঢ়ের অনেক পল্লীতে ধর্মঠাকুর ও শিবমূর্তির মিশ্রণে কিছু স্থানীয় দেবতার উদ্ভব হয়েছে। হাঁসুলী বাঁকের কাহারদের এমন এক দেবতা কর্তা বা বাবাঠাকুর বা বেলবনের মহারাজ। ...কাহারদের বিশ্বাস– এই কর্তা গেরুয়াবস্ত্র পরিহিত রুদ্রাক্ষ ও উপবীতধারী, মুণ্ডিত-মস্তক ; তাঁর পায়ে খড়ম, হাতে দণ্ড ; তিনি রাত্রে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ান ; তাঁর ইচ্ছায় কাহারদের মঙ্গল অমঙ্গল হয়। (দ্রষ্টব্য : রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭)

৪. হাঁসুলীবাঁকের কাহারদের প্রধানতম দেবতা কালরুদ্র। কাহাররা তাকে কালারুদ্দু এবং বাবা বুড়ো শিবও বলে। তাদের ধারণা ইনি বেলতলার বাবাঠাকুর ও ধর্মরাজের চেয়ে বড়। ...কালরুদ্রের কৃপায় তাদের মরণ-বাঁচন ভাগ্যফল লাভ হয়। এঁর বার্ষিক পূজা হয় চৈত্র সংক্রান্তিতে, গাজন উৎসবের মাধ্যমে। (দ্রষ্টব্য : রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭)

৫. ভীষ্মদেব চৌধুরী, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ.২০৪-২০৫

৬. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৩১০

৭. তপোধীর ভট্টাচার্য, 'দ্বিবাচনিকতা ও তারাশঙ্করের কথনবিশ্ব', *উপন্যাসের প্রতিবেদন*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ.৬৭

৮. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৩৫৪

৯. রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

১০. তপোধীর ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

১১. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯